Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

Citizen's Platform
Brief
অক্টোবর ২০১৮ সংখ্যা ১৬

শিক্ষা সংক্রান্ত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও সমতলের আদিবাসীদের জন্য অধিকারভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার দাবি

যুব সম্মেলন ২০১৮
বাংলাদেশ ও এজেন্ডা ২০৩০
তারুণ্যের প্রত্যাশা

১৪ অক্টোবর ২০১৮, ঢাকা, বাংলাদেশ

এই ব্রিফটি *এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ* আয়োজিত "যুব সম্মেলন ২০১৮ – বাংলাদেশ ও এজেন্ডা ২০৩০: তারুণ্যের প্রত্যাশা" উপলক্ষে প্রকাশিত।

জাতি হিসেবে আমরা যে উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি তার মূল দর্শনটি এমন: সবাইকে সমান বিবেচনায় নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। আর এই এগিয়ে যাওয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাথেয় হলো একটি বৈষম্যহীন অধিকারভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা। যে ব্যবস্থায় দেশের প্রতিটি নাগরিক সমান সুযোগ নিয়ে বিকশিত হওয়ার অধিকার পাবে এবং দেশমাতৃকার কল্যাণে নেতৃত্ব দিতে উদ্বুদ্ধ হবে। আজ বিশ্বে যেসব জাতিরাষ্ট্র সফল হয়েছে, তারা সবাই শিক্ষাতেই সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করেছে। তাই আধুনিক বিশ্বে উন্নয়ন নিয়ে এ রকম একটি প্রবাদ আছে: সর্বাগ্রে শিক্ষায় বিনিয়োগ করো।

আজ থেকে ৪৭ বছর আগে স্বাধীন দেশ হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও এখন পর্যন্ত আমরা সফল জাতির কাতারে শামিল হতে পারিনি। তবে আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে শিক্ষায় আমাদের বিনিয়োগ বেড়েছে এবং বাড়ছে অংশগ্রহণের হার। ইতিমধ্যে এর ইতিবাচক ফলাফলও আমরা পাচ্ছি। কিন্তু প্রকৃত উন্নয়ন মাপকাঠিতে উৎরাতে হলে আমাদের এখনো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। অধিকারভিত্তিক ও বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য আমাদের চলমান শিক্ষা ব্যবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে আমূল পরিবর্তন আনতে হবে।

শিক্ষা নিয়ে যে কোনো আলোচনা বৃহৎ পরিসরে করা সম্ভব। কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধটি আমরা সীমাবদ্ধ রাখব মূলত শিক্ষা নিয়ে জাতীয় ও বৈশ্বিক অঙ্গীকার, সমতলের আদিবাসীদের শিক্ষার পরিস্থিতি ও তার উন্নয়নে কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবের মধ্যে। প্রবন্ধটি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা, আদিবাসী তরুণ-তরুণীদের সাথে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন ও সংশ্লিষ্ট গবেষণাভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে।

শিক্ষা সংক্রান্ত অঙ্গীকার ও বিদ্যমান বাস্তবতা

আমাদের সংবিধানেই সবার জন্য সমান সুযোগের অঙ্গীকার করা হয়েছে, ২৭, ২৮ ও ২৯ অনুচ্ছেদে সবার সমান সুযোগের কথা আছে। বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি, জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রগত কারণে কোনো প্রকার বৈষম্যের শিকার হবেন না। এর অর্থ হলো, রাষ্ট্র এমন কোনো আইন বা নীতিমালা প্রণয়ন করবে না, যা কারও প্রতি কোনো প্রকার বৈষম্যের কারণ হয়। এবং সেটা অবশ্যই শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু সংবিধানের এই অঙ্গীকার অনুযায়ী রাষ্ট্র সব ব্যবস্থা নিতে পারেনি। আমরা এখন পর্যন্ত দেশে কয়েক রকম শিক্ষা ব্যবস্থা দেখতে পাই, যা অব্যাহত রেখে কোনোভাবেই বৈষম্যহীন শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। শিক্ষায় সমান সুযোগ তৈরি করার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে তেমন কোনো প্রচেষ্টা চোখে পড়ে না। বরং টাকা দিয়ে শিক্ষা নেওয়ার যে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তা সংবিধানের মূল চেতনাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিব্যি চলছে!

নারী উন্নয়ন নীতিমালায় নারীর উন্নয়নকে জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত বলা হয়েছে। সরকার নারী উন্নয়নের আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমূহে অনুসমর্থন দেওয়ার পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়েও অনেক ইতিবাচক উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু এতকিছুর পরও পরিস্থিতি সেভাবে পাল্টায়নি। অনেক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা সুস্পষ্ট। যেমন, সকল অগ্রগতি সত্ত্বেও আদিবাসী নারীদের জীবনে প্রগতির তেমন একটা ছাপ পড়েনি; বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে। আদিবাসী নারীদের মধ্যে শিক্ষার হার এখনো অনেক কম।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় জোর দেয়া হয়েছে, যেখানে সুবিধাবঞ্চিত, প্রান্তিক ও নারীদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা, অর্থাৎ ভিশন ২০২১-এও শিক্ষার অগ্রগতিতে সর্বোচ্চ বিনিয়োগের কথা বলা হয়েছে।

বাজেটে জাতীয় উন্নয়নে সরকারের অঙ্গীকারের প্রতিফলন দেখা যায়। স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত সব সরকারই শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিয়েছে। প্রতিবছর এর অঙ্কও বেড়েছে । কিন্তু প্রতি বছর মোট বাজেটের তুলনায় শিক্ষায় আনুপাতিক বরাদ্দ কমছে, যেমন ২০১৮-১৯ অর্থবছরে শিক্ষা খাতে মোট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৫৪ হাজার কোটি টাকা, যা মূল বাজেটের ১১.৪১ শতাংশ ও জিডিপির ২.২ শতাংশ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে যা ছিল মোট বাজেটের ১৪.৩৯ শতাংশ ও জিডিপির ২.৪৯ শতাংশ। তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে, জিডিপির অনুপাতে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ প্রতি বছর কমছে। অথচ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জিডিপি থেকে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ হওয়ার কথা ন্যূনতম ৪ শতাংশ।

টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে গৃহীত টেকসই উন্নয়নের ১৭টি অভীষ্টের চতুর্থ অভীষ্টটি হলো শিক্ষা, যার ১০টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো-

- ২০৩০ এর মধ্যে সকল বালক ও বালিকা মানসম্মত, সমতাভিত্তিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করবে, যা তার উন্নত ভবিষ্যতের বুনিয়াদ গড়ে দেবে।
- ২০৩০ সালের মধ্যে সব মেয়ে ও ছেলে মানসম্মত ও স্বল্প খরচে কারিগরি ও উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করতে পারবে।
- ২০৩০-এর মধ্যে যাদের কারিগরি বা ভকেশনাল কাজে দক্ষতা আছে এমন সকল যুবক-যুবতী ও পরিণত বয়সের মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।
- ২০৩০ সালের মধ্যে কর্মসংস্থান, সম্মানজনক কাজ ও উদ্যোগ হিসেবে যুব ও দক্ষ জনগোষ্ঠীর যুক্ততা বৃদ্ধি করা হবে, বিশেষ করে যাদের কারিগরি বা ভকেশনাল কাজে প্রাসঙ্গিক দক্ষতা রয়েছে।
- ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষায় লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণ, সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার সকল স্তরে প্রবেশে সমান সুযোগ তৈরি করা, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী ও আদিবাসীদের, যারা প্রান্তিক অবস্থায় আছে।

শিক্ষায় অগ্রগতি ও আদিবাসীদের বাস্তবতা

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ ছিল অনেক কম (১৬.৪৩ শতাংশ) এবং পুরুষ শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণও ছিল অনেক কম অর্থাৎ ৩৬.৬৩ শতাংশ (বাংলাদেশ পপুলেশন এণ্ড হাউজিং সেনসাস - ২০১১, ২০০১)। তখন শিক্ষা উন্নয়ন ও শিক্ষায় গুণগত পরিবর্তন আনার বিষয়টি তেমন অগ্রাধিকার পায়নি। কারণ, সদ্য স্বাধীন দেশ হিসেবে আরও অনেক বিষয়ে বাস্তব কারণে অগ্রাধিকার দিতে হয়েছে। আমরা শিক্ষার বিষয়ে প্রথম সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা পাই মূলত-কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা নীতি থেকে। এই শিক্ষানীতিতে প্রথম নারী শিক্ষায় জাতীয় পরিকল্পনা ও বিনিয়োগের কথা জোরের সাথে বলা হয়। এরপর ১৯৮২ সালে নারী শিক্ষায় বিশেষ জোর দেয়ার অংশ হিসেবে নারীদের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে বৃত্তি চালু করা হয়। ওই কার্যক্রমের সফলতায় ১৯৯৪ সাল থেকে নারী শিক্ষায় উপবৃত্তি কার্যক্রম জাতীয়ভাবে চালু করা হয় (ফিমেল এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রোগ্রাম ২০০৩-ইউনেস্কো)। শিক্ষায়, বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য এই উপবৃত্তি কার্যক্রমের ফলে ১৮ শতাংশ থেকে নারীর অংশগ্রহণ বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৮৭ শতাংশে, পুরুষের অনুপাতে যা প্রায় ৪৭ শতাংশ।

স্বাধীনতার পর বিভিন্ন সরকারের বহুমুখী প্রচেষ্টায় শিক্ষা ক্ষেত্রে বহুবিধ অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে, যেমন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার দাঁড়িয়েছে ৯৭ শতাংশে। বাংলাদেশ এডকেশন স্ট্যাটিসটিক্স ২০১৫ অনুসারে ঝরে পড়ার হার ২০০৫ সালে যেখানে ছিল ৪৭ শতাংশ, সেখানে ২০১৫ সালে তা কমে দাঁড়ায় মাত্র ২০.৪ শতাংশে। মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তির হার বেড়ে হয়েছে ৭২.৭৮ শতাংশ যা ২০০১ সালে ছিল মাত্র ৪৩ শতাংশ (এডুকেশন ২০৩০ ইন বাংলাদেশ: এ সিভিল সোসাইটি পারসপেকটিভ)। কিন্তু এতসব অগ্রগতি সত্ত্বেও মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হার এখনো অনেক বেশি, প্রায় ৪০.২৯ শতাংশ (বাংলাদেশ এডুকেশন স্ট্যাটিসটিক্স-২০১৫)। বাজেটে শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হলেও বরাদ্দের দিক থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান এখনো অনেক নিচে।

শিক্ষায় যে অগ্রগতি তা শুধু সংখ্যায় বিচার করলে হবে না, দেখতে হবে এর গুনগত দিকটিও। শুধু ৭২ শতাংশ শিক্ষার্থী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছে দেখে আনন্দিত না হয়ে বিষয়টি সমালোচকের দৃষ্টিতেও দেখা দরকার: এর মধ্যে কতজন শিক্ষার্থী সমতলের আদিবাসী অথবা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী থেকে আসা। আর যারা ঝরে পড়ছে, তাদের মধ্যে কত শতাংশ প্রান্তিক ঘরের সন্তান। সেই হিসাব যদি করা যায়, তাহলে আপাত এই অগ্রগতির গুণগত দিকটি সুস্পষ্ট হবে।

মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতা হলো, আদিবাসীরা আদিকাল থেকে সাধারণত সমাজের প্রান্তে বসবাস করে। ফলে তাদের এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক কম এবং অনেক ক্ষেত্রেই বসতবাড়ি থেকে দূরে। এ কারণে ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে অনেক সময় তারা নিয়মিত বিদ্যালয়ে যেতে পারে না, আর সে জন্য ফলাফল খারাপ করে। এক পর্যায়ে ঝরে পড়ে। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা যায়, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে আদিবাসীদের সংখ্যাই বেশি।

আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা এখনো সেভাবে চালু হয় নি। মাতৃভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষায় শিক্ষা নেওয়ায় তারা আর দশজনের মতো ভালো ফলাফল করতে পারে না এবং খুব স্বাভাবিক কারণে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে। এটাও তাদের ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ। যদিও এখন আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষায় কিছু বই প্রণীত হচ্ছে, কিন্তু সকল আদিবাসীদের জন্য এসব বই-এর সরবরাহ নিশ্চিত করতে আরও অনেক সময় লাগবে। এর জন্য বিশেষ ধরণের শিক্ষা অবকাঠামো বা বরাদ্দ দরকার হবে, যা অবশ্যই সময়সাপেক্ষ বিষয়। এ ছাড়া কোন হরফে তাদের জন্য বই রচিত হবে এ নিয়ে আদিবাসীদের মধ্যে এখনো ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

বাণিজ্যিকীকরণ ও নানামুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ায় শিক্ষা দিনে দিনে দরিদ্রদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। ফলে যারা দরিদ্র, বিশেষ করে আদিবাসীরা, সন্তানদের শিক্ষা ব্যয় বহন করতে হিমশিম খাচ্ছেন। যেখানে অধিকাংশ আদিবাসী দিন আনে দিন খায়, সেখানে তারা কীভাবে শিক্ষার বাড়তি ব্যয় বহন করবেন। ফলে খুব বাস্তব কারণে আদিবাসীদের শিক্ষায় প্রবেশাধিকার সংকুচিত হয়ে পড়ছে।

অন্যদিকে আদিবাসীদের সম্পর্কে বিদ্যমান সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিও তাদের শিক্ষালাভের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা বলে, অনেকেই মূল ধারার শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের কাছ থেকে বাধার সম্মুখীন হন। যেমন, তাদের নিচু জাতের মানুষ মনে করা, তাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস নিয়ে কটাক্ষ করা ইত্যাদি কোমলমতি আদিবাসী শিক্ষার্থীদের সাংঘাতিক মন:পীড়ার কারণ হয়। শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ার পেছনে এসব কারণ অনেকাংশে দায়ী। অর্থাৎ শুধু দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের কারণে অ-আদিবাসী সহপাঠীও তাদের জন্য সহায়ক হচ্ছে না। এই অবস্থার আশু পরিবর্তন জরুরি।

নিরাপত্তাহীনতাও আদিবাসীদের জীবনের একটি অন্যতম অনুষঙ্গ। তারা সংখ্যালঘু হওয়ায় এবং ভিন্ন কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে জীবন নির্বাহ করায় তাদের বিচ্ছিন্নতা অনেক স্পষ্ট। এ ছাড়া শিক্ষা অবকাঠামোগুলো আদিবাসীদের বসতবাড়ি থেকে দূরে হওয়ায় শিক্ষার্থীরা, বিশেষ করে শিশু ও উঠতি বয়সের মেয়েরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। ইভটিজিং বা শ্লীলতাহানির আশংকায় তারা অনেকেই নিয়মিত বিদালয়ে যেতে চায় না। ফলে অনেকেই ফলাফল খারাপ করে এবং এক পর্যায়ে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে। এদের মধ্যে নারী শিক্ষার্থীদের অনিবার্য পরিণতি হয় বাল্যবিবাহ, যা শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ার অন্যতম নেতিবাচক পরিণতি।

আদিবাসীদের সনাতন জীবিকা হলো কৃষি। তাদের জীবিকা কৃষিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। কিন্তু পরিবর্তিত বাস্তবতায় সনাতন জীবিকায় নানা পরিবর্তন এসেছে। জমির মূল্য বৃদ্ধি, কৃষিভিত্তিক জীবনব্যবস্থার জায়গায় কারিগরি বা শিল্পায়ন কেন্দ্রিক পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো আদিবাসীদের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ। গতানুগতিক জীবনধারায় অভ্যস্ত আদিবাসী শিক্ষার্থীরা কারিগরি শিক্ষায় অনেক পিছিয়ে। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে যাওয়ায় তাদের মধ্যে হতাশা বাড়ছে।

করণীয়

দেশে দারিদ্র্যের হার এখন ২৪.৮ শতাংশ। অন্যদিকে চরম দারিদ্র্যের হার ১২.৯ শতাংশ। অর্থাৎ এখনো প্রায় ২৫ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। এই বিরাট সংখ্যক দরিদ্র মানুষের মধ্যে সমতলের আদিবাসীরাও আছে। পরিমিত খাদ্যের অভাব,

স্বাস্থ্য হীনতা ও শিক্ষার জন্য বিনিয়োগ করতে না পারা দারিদ্র্যের অন্যতম নেতিবাচক ফলাফল। দরিদ্র আদিবাসীরা বৈষয়িক চাহিদা মেটাতে গিয়ে শিক্ষায় বিনিয়োগ করতে পারে না। ফলে দরিদ্র আদিবাসীর সন্তানেরা শিক্ষা থেকে অধিক হারে ঝরে পড়ছে।
২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সমতলের আদিবাসীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। এখানে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখা হলো:

- দেশে বৈষম্যহীন ও অধিকারভিত্তিক একই ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা, যাতে সমতলের আদিবাসী শিক্ষার্থীরাও একই ধারার শিক্ষায় নিজেদের গড়ে তুলতে পারে।
- দারিদ্র্যের সূচকে দেশের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া অঞ্চল ও সমতলের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলোকে চিহ্নিত করে একটি বিশেষ জরিপ পরিচালনা করা, যাতে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়, ঠিক কী পরিমাণ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে, তার কারণ কী ও তার প্রতিকারে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।
- যেসব এলাকার শিক্ষার্থীরা শিক্ষা থেকে অধিকহারে ঝরে পড়ছে সেই এলাকাগুলোকে বিশেষ শিক্ষা অগ্রাধিকার অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করা এবং তার জন্য বিশেষ বরাদ্দ ও উন্নয়ন পরিকল্পনা করা।
- কারিগরি ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক শিক্ষায় সমতলের আদিবাসীদের অধিক হারে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া। এতে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি দরিদ্র আদিবাসী শিক্ষার্থীরা কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে। এর জন্য আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় কারিগরি বা ভকেশনাল শিক্ষা অবকাঠামো তৈরিতে বিশেষ জোর দেওয়া প্রয়োজন।
- দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া আদিবাসীদের জন্য বিশেষ বরাদ্দ ও বৃত্তির ব্যবস্থা করা, যাতে করে তারা এই বিশেষ প্রণোদনা নিয়ে শিক্ষায় যুক্ত হতে উৎসাহী হয়।
- সমতলের আদিবাসীদের নিয়ে বিদ্যমান নেতিবাচক ধারণা দূর করতে বিশেষ কিছু প্রক্রিয়ায় সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালু রাখা, যাতে করে নতুন প্রজন্ম এ বিষয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বেড়ে ওঠে।

HEKS EPER

এই ব্রিফটি প্রস্তুত করেছে হেকস/ইপার (www.en.heks.ch/was-wir-tun/landesprogramm-bangladesch)। হেকস/ইপার এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ-এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান।

ব্রিফটিতে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবে প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের। এই মতামত কোনোভাবেই এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ বা প্ল্যাটফর্ম সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতামতের প্রতিফলন নয়।

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ বৈশ্বিকভাবে গৃহীত 'টেকসই উন্নয়ন অর্জনে এজেন্ডা ২০৩০' বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে গঠিত দেশের নাগরিক সমাজের একটি উদ্যোগ। ২০১৬-র জুনে নাগরিক সমাজের ব্যক্তি পর্যায়ের উদ্যোগে এ প্ল্যাটফর্ম আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। এ প্ল্যাটফর্মের মূল লক্ষ্য হলো, বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা এবং এ প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি নিশ্চিত করা। এজেন্ডা ২০৩০ বাস্তবায়নের ব্যাপকতা ও চ্যালেঞ্জের দিকগুলো বিবেচনা করলে বোঝা যায় এর সফলতার ক্ষেত্রে বহু-অংশীজনভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আর এই ধারণা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েই প্ল্যাটফর্মটির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। দেশব্যাপী এসডিজি বাস্তবায়নে কাজ করছে এমন ৮৮টি সংস্থা বর্তমানে প্ল্যাটফর্মের সহযোগী সংগঠন হিসেবে যুক্ত রয়েছে।

www.bdplatform4sdgs.net BDPlatform4SDGs BDPlatform4SDGs

সচিবালয়: **সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), ঢাকা**
ফোন: (+৮৮ ০২) ৯১৪১৭৩৪, ৯১৪১৭০৩, ৯১২৬৪০২ ওয়েব: www.bdplatform4sdgs.net ই-মেইল: coordinator@bdplatform4sdgs.net